“স্মৃতিময় দাদু”

বন্দুরা আজ যার সম্পর্কে আপনাদের কে জানাব বলে মনে করছি তিনি আর কেউ নন, আমার অতি আপনজন, অতি প্রিয় ব্যাক্তি, জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ জহির উদ্দীন।

জন্ম আনুমানিক ১৯৪৩/৪৪ সালের মধ্যে হবে।রাজশাহী জেলার তানোর থানার বৈদ্যপুর গ্রামে। তার পিতার নাম মোঃ খাজির উদ্দীন। তিন ভাই ও এক বোনের সবচেয়ে ছোট তিনি।

ষাটের দশকে বৈদ্যপুর গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত মানুষ ছিলেন।তিনি মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন নি তবে বিরোধীতাও করেন নি। আর যুদ্ধের সময় এই গ্রামের মানুষ কিছু বুঝতেই পারেনি যে বাংলাদেশে যুদ্ধ হচ্ছে। তবে যুদ্ধ শেষে একদল আলবদর বাহীনি এই গ্রামের মধ্য দিয়া পালিয়ে গয়েছিল আর তাদের পিছনে মুক্তি বাহিনী তাড়া করে আমাদের গ্রামে পৌঁছে গ্রামের সকল যুবকদের মাঠে লাইন করে পরিক্ষা করে ছেড়ে দেয়।পরে তারা আমাদের গ্রাম হতে তিন গ্রাম উত্তরে আলবদর বাহিনীকে ধরে ফেলে হত্যা করে। আর এতেই সাধারন মানুষ বুঝতে পারে যে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে।

যা হোক যাকে নিয়ে আমার আজকের লিখা সেই বিষয়ে আসি। তিনি রহমানিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন বলে নিজের গ্রাম সহ তানোর থানার প্রায় গ্রামে ইমামতি করার অভিজ্ঞতা ছিল তার। ফলে সারা থানার মানুষ তাকে এক নামে চিনত, মাওলানা জহির উদ্দীন। তাঁর আরবী, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজী ভাষায় বেশ দখল ছিল।

আমার জন্মের পর হতে তাঁকে গ্রামের মক্তব ও জুম্মার খুদবায় দেখতাম। গ্রামের মক্তবে আমি নিজেও তাঁর নিকট আরবী পড়া শিখেছি।আমি পড়া ভাল পারতাম বলে আমাকে খুব আদর করতেন।আমি দাদা বলে দাক্তাম।তিনি খুব ভাল গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন।চিকিতসায় তাঁর চারিদিকে খুব সুনাম ছিল।

বায়োকেমিক মতে সে সময় চিকিতসা করতেন।বায়োকেমিক হল কেমক্যাল দিয়ে কোন অসুখের জন্য কি ঔষুধ তা নিজেই সিরাপ তৈরি করে দিতেন।আগে এখুনকার মত তৈরি সিরাপ পাওয়া যেত না।

ঘোড়া পোষা শখ ছিল তাঁর। এক সঙ্গে একাধিক ঘোড়া পুষতেন। তাঁর একটা ঘোড়া ছিল পচি, আর একটার নাম হল ভুট্টু। পচি ছিল মাদি আর ভুট্টু ছিল টাটু ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিতসা করতেন আবার ওয়াজ নছিয়ত করতেন। সব সময় রাজকীয় ভাবে চলতেন।

জীবনে বিয়ে করেছেন ছয়টি। কিন্তু সেই প্রথম বিয়ের বউ শেষ পর্যন্ত টিলে থাকে বাকিরা কেউ মারা যায় কেউ তালাক নিয়ে চলে যায়।তার ঔরশজাত সন্তান হয় ষোলটি, কিন্তু ডায়রিয়া মহামারিতে আটটি ছেলে মেয়ে মারা যায়। এখুন পর্যন্ত আটটি সন্তান জীবিত আছে।

সংসার বড় হতে থাকলে তাঁর সংসারে অভাব অনটন শুরু হয়। আগের মত ডাক্তারী, ইমামতি ভাল চলে না। খুব দুঃখ কষ্টে কোন মতে চলছিল তাঁর সংসার।

এরি মধ্যে ১৯৯৪ ইংরেজী সালে অত্র বৈদ্যপুর গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে সেই মাদ্রাসায় একজন এবতেদায়ী সহকারী ক্বারী শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।ফলে তাঁকে আহবান করা হয় উক্ত পদের জন্য। কিন্তু তাঁর ক্বারী সার্টিফিকেট না থাকায় পরামর্শ দেওয়া হয় মুন্ডুমালা কামিল মাদ্রাসা হতে ক্বারীয়ানা পরিক্ষা দিতে। পরামর্শ অনুযায়ী পরের বার পরিক্ষা দিয়ে প্রায় ৬২ বছর দাখিল মুজাব্বিদ শাখা হতে পুনরাই পাশ করেন। আর সেই সার্টিফিকেট বলে ১৯৯৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সাথে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

কিন্তু মাদ্রাসায় বেতন চালু না থাকায় তাঁর সংসারে তখন ও অভাব লেগে থাকে। তাই সে আবার নতুন ভাবে ডাক্তারী পেশা শুরু করেন এবং নিজ গ্রামে ৪০০ টাকা মাস বেতনে আবার জুম্মার ইমামতি শুরু করেন। ২০০১ সালে মাদ্রাসা এম্পিওভুক্ত হলে আবার সংসারে সাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

এক সঙ্গে চাকুরী করতাম আর সম্পর্কে দাদা হইয়ায় খুব হাসি-ঠাট্টা করতাম, খুব মজা করতাম। দাদা আমাকে নামাজ পড়তাম না না বলে প্রায় বলতেন, তোর সবি ভালরে দাদা শুধু নামাজ পড়িস না, চল দাদা নামাজ পড়ি। আমার আজও মনে পড়ে দাদার সেসব কথা।

২০১২ সালে ০৪ জানুয়ারী দাদাকে একদম চমকে দিয়ে হঠাত মসজিদে ফজরের নামাজে সামিল হই। নামাজ শেষে দাদা আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রায় আধাঘন্টা ধরে মোনাজাত করলেন সকলকে সাথে নিয়ে, তাঁর কি আকুতি খোদার কাছে , আমার চোখে জল চলে এসেছিল সেদিন প্রথম কোন মোনাজাতে। আমিও আমীন আমীন বলছিলাম আর ভাবছিলাম আল্লাহ তুমি তাঁর আকুতি কবুল করিও। সেই দিন হতে আমি আজ পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়িনি ইনশাআল্লাহ। মসজিদ হতে বেরোবার পর দাদা আমাকে জড়িয়ে কোলাকুলি করলেন, আর সেই সাথে তাঁর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত দিলেন।

দাদা বহুদিন আগে থেকেই গুড়ের চা খেতেন। সংসারে অভাব থাকলেও চা তাঁর বাড়ি থেকে কখন বাদ যায় নি। চা খেতেন বড় একটি মগে।

২০১০ সালে সম্ভবত তিনি কিছু ধানি জমি বিক্রি করে হজ্ব করে আসেন।

তিনি প্রায় বলতেন রিটাইরমেন্টের টাকা পেলে তিনি ওমরা হজ্ব করবেন।

২০১৩ সালের ২৬ই অক্টবর সকালে খবর পেলাম দাদা অসুস্থ। সকালে দেখতে গেলাম, তখন দাদার কোন জ্ঞান ছিল না।সেই দিন রাত ১২.০০ টার দিকে তিনি হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরের দিন মেডিকেলে ভর্তি করা হলে বিভিন্ন পরিক্ষা নিরিক্ষায় ধরা পড়ে তাঁর ডায়াবেটিস

অতিমাত্রায় হওয়ার কারনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। বহু চেষ্টা করে ডাক্তারেরা তাঁর জ্ঞান ফিরাতে ব্যার্থ হলে একদিন পর তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। ২৮/১০/২০১৩ তারিখে বাড়ি ফিরার প্রায় দুই তিন ঘন্টা পরে ঠিক মাগরিবের নামাজের সময় আমাদের মায়া কাটিয়ে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন।

ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাহীর রজিউন। আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাত নসিব করুন। আমীন---।

মোঃ খোশবুর আলী---২১/১০/২০১৯